কবিজীবনী ও কাব্যপ্রসঙ্গ

বাংলা মঙ্গলকাব্যধারার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কবি হলেন মুকুন্দ চক্রবর্তী। অষ্টাদশ শতকের কবি ভারতচন্দ্র ছাড়া মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যধারায় তাঁর সমতুল কবি আর কেউ ছিলেন না। মধ্যযুগে অসংখ্য মঙ্গলকাব্য রচিত হলেও মুকুন্দের কাব্য তাঁর বিশিষ্ট যুগচেতনা ও শিল্পচেতনার গুণে স্বতন্ত্র ছিল। সাংসারিক অর্থে সফল না হলেও কাব্যসংসারে চিরকালই তিনি বন্দিত ও আলোচিত। পাঁচশ বছরের সীমানা পেরিয়েও তিনি সমান প্রাসঙ্গিক। বাংলা উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটকের উৎসমূলে কবি মুকুন্দের নাম বারংবার প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। তাঁর সৃষ্ট কাহিনী – চরিত্র- ভাবনার ভাষ্যদানের প্রয়োজন আজও হয়ে থাকে। এখানে তাঁর সত্তার কালজয়ী হওয়ার শক্তি লক্ষিত হয়। তাঁর রচিত কাব্যে বাস্তবতা ও কল্পনার মিশ্রণ যেভাবে তিনি ঘটিয়েছেন, তা মঙ্গলকাব্যধারায় নিতান্ত সুলভ নয়।

কবিজীবনী: কবি মুকুন্দ আপন জীবনকথা একটানা লেখেন নি। তা ছড়িয়ে আছে গ্রন্থোৎপত্তির কারণ, বন্দনার নানান জায়গা আর প্রার্থনার অংশগুলিতে। বিচ্ছিন্ন তথ্যগুলিকে গ্রথিত করলে জানা যায় যে, কবি বর্ধমান জেলার রায়না থানার রত্নানু নদের তীরে দামুন্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এখানে তাঁদের ছয়- সাত পুরুষের বাস ছিল। পুরুষানুক্রমে কবিরা দামুন্যার তালুকদার গোপীনাথ নন্দীর জমি ভোগ করতেন। পরে রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে গোপীনাথের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হলে ও তিনি কারারুদ্ধ হলে তাঁর ভরসা ত্যাগ করে কবি নিজের জমি-জমা, বসতবাড়ি ত্যাগ করে দামুন্যা ছেড়ে ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে পড়েন। দামুন্যা ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন চণ্ডিবাটি গ্রামের শ্রীমন্ত খাঁ ও মুনিব খাঁ র পরামর্শে। কাব্যের 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণ' অংশে কবি এই অনির্দেশ যাত্রার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। পথে যদু কুণ্ডুর সহৃদয় দাক্ষিণ্যের কথা কবি স্মরণ করেছেন। তারপর তেউট্যায় পৌঁছে গঙ্গাদাসের সাহায্য পান এবং শেষ পর্যন্ত মেদিনীপুরের আরড়া গ্রামে বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাঁকুড়া রায় তাঁকে পুত্র রঘুনাথের গৃহশিক্ষক রূপে নিয়োজিত করেন। এখানেই কবি কাব্যরচনা করেন।

কাব্যরচনার সময়কাল: মুকুন্দের কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। মানসিংহ, বাঁকুড়া রায় এবং রঘুনাথ রায়ের উল্লেখের মাধ্যমে একটি সময়কালের নির্ণয় করা যায়। 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণ' অংশে ভূস্বামী বাঁকুড়া রায় এবং রঘুনাথ রায়ের নাম উল্লিখিত হয়েছে। এঁদের মতে রঘুনাথ রায়ের রাজত্বকাল ১৫৭৩ খ্রি: থেকে ১৬০৩ খ্রি: পর্যন্ত। এছাড়াও কাব্যের

অন্যান্য অভ্যন্তরীণ তথ্য থেকেও উপলব্ধি করা যায়, মুকুন্দের কাব্যের রচনাকাল ১৬০৪ খ্রি: এর পূর্বে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দে রঘুনাথ রায়ের পুত্র চক্রধর শর্মা কেশিয়াড়িতে সর্বমঙ্গলা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। যেহেতু মুকুন্দের কাব্যের বন্দনা অংশে সর্বমঙ্গলার বন্দনা নেই, সেহেতু সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে , ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দের আগে মুকুন্দ কাব্য রচনা করেন।

কবির ধর্মমত: কবি মুকুন্দের ধর্মমত বিষয়ে সমালোচক মহলে মতভেদ যথেষ্ট। আর এই মতভেদের কারণ তিনি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা হলেও , তাঁর বাড়িতে মহিষমর্দিনী প্রতিমা ছিল যাঁর চার হাতে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম সহ গলায় বনমালা ছিল। মুকুন্দের পিতামহ জগন্নাথ বহুকাল আমিষ আহার ত্যাগ করে দশাক্ষর গোপাল মন্ত্র জপসহ গোপাল পূজা করতেন। এছাড়াও কবি স্বয়ং জানিয়েছেন যে, তাঁরা পুরুষানুক্রমে চক্রাদিত্য শিবের সেবক ছিলেন। কবির কাব্যেও এই সর্বধর্ম সহিষ্ণুতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কবির 'গুজরাট নগর পত্তন' অংশ তার সাক্ষ্য দেয়।

দেবী চণ্ডীর উৎপত্তি: কবি মুকুন্দের কাব্যে দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্যকীর্তন করা হয়েছে। এই চণ্ডীদেবীর উদ্ভবের পিছনে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি, অনার্য সংস্কৃতি, বৌদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাবও রয়েছে। বাংলায় চণ্ডীমঙ্গলের দেবী চণ্ডী বা চণ্ডিকার পূজা, ব্রত নিয়ম, কাহিনী প্রভৃতি অত্যন্ত জটিল। কেননা, কেউ কেউ চণ্ডীমঙ্গলের দেবীকে ব্রাহ্মণ্য ও পৌরাণিক ভাবধারার বলে মনে করেছেন। আবার কেউ অনার্য সমাজের কিরাতদের দেবীর সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজেছেন। কেউ বা বৌদ্ধদেবীকে চণ্ডীতত্ত্বের মূল বলেন। সুতরাং চণ্ডীমঙ্গলের দেবী চণ্ডীর উৎপত্তির ক্ষেত্রে যে উপাদানগুলির পাওয়া যায় তা হল- ১) জাপানে সপ্তকোটি বুদ্ধমাতৃকা চনষ্টী দেবীর সঙ্গে দেবী চণ্ডীর সাদৃশ্য রয়েছে। ২) বৌদ্ধ দেবী মারীচিও চণ্ডীর মত দশভূজা। বুদ্ধদেব অভয়াদেবীর পদবন্দনা করতেন। ৩) বেদে ও উপনিষদের ভুবনেশ্বরী, অম্বিকা, উমার সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গলের দেবীর সাদৃশ্য রয়েছে। ৪) দেবী ভাগবতে ও বৃহদ্ধর্ম পুরাণে চণ্ডীর উল্লেখ রয়েছে। ৫) ঋগ্বেদের দশম সূক্তে মঙ্গলচণ্ডী(অরণ্যানী) র উল্লেখ রয়েছে। ৬) ওঁরাও উপজাতিদের পূজিতা দেবী চাণ্ডী শিকারের দেবী।

চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী: চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী দুটি- কালকেতু ও ফুল্লরার কাহিনী, যা 'আখেটিক খণ্ডে'র অন্তর্গত এবং ধনপতি- খুল্লনা- লহনার কাহিনী যা 'বণিকখণ্ডে'র অন্তর্গত।

কালকেতু ও ফুল্লরার কাহিনী: ব্যাধ সমাজে কিভাবে দেবী চণ্ডীর পূজা প্রচলিত হল, এই আখ্যানে তাই বর্ণিত হয়েছে। দেবী চণ্ডী মর্ত্যে আপনার পূজার প্রচলন করতে চান। সাংসারিক দিকে স্বামী মহাদেবের সঙ্গে তাঁর নিত্য বিরোধ। মর্ত্যে পূজা প্রচলনের মাধ্যমে সেই সমস্যার সমাধান করতে

চান। তাই ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরকে শাপগ্রস্ত করে তিনি মর্ত্যে পাঠালেন, নীলাম্বরের সঙ্গে মর্ত্যে এলেন পত্নী ছায়া। নীলাম্বর মর্ত্যে ব্যাধ ধর্মকেতুর পুত্র কালকেতু রূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং পত্নী ছায়া জন্মগ্রহণ করেন সঞ্জয়কেতু ব্যাধের কন্যা ফুল্লরা রূপে। দিনে দিনে কালকেতু বড় হয়ে উঠতে লাগলেন, কিরাতপাড়ায় তার তুল্য কেউ নেই। অসীম তার পরাক্রম। ছুটে ধরে ফেলে হরিণ। পশুরা কালকতুর ভয়ে ভীত স্বন্ত্রস্ত হয়ে উঠতে লাগল। বিপন্ন পশুরা অবশেষে দেবী চণ্ডীর কাছে বরাভয় প্রার্থনা করল। দেবী পশুদের অভয় প্রদান করলেন। তাই দেবী একদিন মায়াবলে পশুদের লুকিয়ে রেখে , নিজে সুবর্ণ গোধিকার রূপ ধারণ করে কালকেতুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। সেদিন বনে কোনো শিকার না পেয়ে কালকেতু সেই স্বর্ণগোধিকাকেই বেঁধে ঘরে নিয়ে এলেন। কালকেতুর পত্নী ফুল্লরা শিকারের এই অবস্থা দেখে প্রতিবেশীর কাছে খুদ চাইতে গেলেন। কালকেতু গেলেন বাসি মাংস বিক্রি করতে। ফুল্লরা ঘরে ফিরে দেখেন , ঘরে এক ষোড়শী রূপসী বামা বসে আছে। ফুল্লরা জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন কালকেতুই তাকে ঘরে এনেছে। সপত্নী আশঙ্কায় ফুল্লরা তাকে বারোমাসের দুঃখের কাহিনী বিবৃত করতে থাকে। ইতিমধ্যে কালকেতু এসে পড়ায় ফুল্লরা তাকেও তিরস্কার করেন। কালকেতু সেই মেয়েকে চলে যেতে বললেও সে যেতে নারাজ। অবশেষে, অনেক বাদানুবাদের পর দেবী স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হন। কালকেতুকে ধনদান করে দেবী গুজরাট নগরে রাজ্যস্থাপন করতে বলেন। সেইমত কালকেতু ব্যাধবৃত্তি ত্যাগ করে রাজ্যস্থাপন করেন। কলিঙ্গ নগরে ঝড়- বৃষ্টি ঘটিয়ে দেবী কালকতুর রাজ্যে প্রজার বন্দোবস্ত করে দেন। কালকেতু সুখে রাজ্য পরিচালনা করবার উপক্রম করেন। কিন্তু এরমধ্যে বিঘ্ন ঘটিয়ে দেয় খল ভাঁড়ু দত্ত। ভাঁড়ু দত্তের ষড়যন্ত্রে কালকেতুর সঙ্গে বিবাদ বাঁধে কলিঙ্গরাজের। দেবীর কৃপায় কালকেতু কলিঙ্গরাজের কারাগার থেকে মুক্তি পান। ভাঁড়ু দত্তের শাস্তি হয়। অবশেষে কালকেতু বহুবছর শান্তিপূর্ণভাবে রাজত্ব করে, মর্ত্যে শাপের কাল পূর্ণ করে , পুত্র পুষ্পকেতুর হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করে, ফুল্লরাকে নিয়ে সশরীরে স্বর্গগমন করেন। এইভাবে ব্যাধ সমাজে দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়।

বণিক খণ্ড- ধনপতির উপাখ্যান: ধনপতি সদাগর ছিলেন উজানী নগরের বিখ্যাত বণিক। ধর্মমতে তিনি ছিলেন শৈব। অর্থও সামাজিক প্রতিপত্তির দিক থেকে ধনপতি ছিলেন বণিক সমাজের উচ্চে, তাই দেবী চণ্ডী ধনপতিকে দিয়েই আপন পূজা প্রচারের উদ্যোগ করেন। এই কারণে দেবী চণ্ডী স্বর্গের নর্তকী রত্নমালাকে শাপ দিয়ে মর্ত্যে পাঠান। রত্নমালা মর্ত্যে খুল্লনা নামে পরিচিত হন। ধনপতি সদাগরের দুই স্ত্রী – লহনা ও খুল্লনা। সপত্নী খুল্লনাকে লহনা ঈর্ষার চোখে দেখতেন।

তাই ধনপতির অগোচরে লহনা খুল্লনার উপর নির্যাতন শুরু করে। ধনপতির নামে একটি জাল চিঠি বানিয়ে লহনা খুল্লনাকে ছাগল চরাতে ও ঢেঁকিশালে শয়ন করতে বাধ্য করে। লহনার নির্যাতন থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য খুল্লনা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করতে শুরু করে। এরপর ধনপতি ফিরে এলে প্রকৃত ঘটনা শুনে লহনাকে তিরস্কার করেন। দেবী চণ্ডী স্বর্গের মালাধরকে শাপগ্রস্ত করে মর্ত্যে পাঠান খুল্লনার সন্তানরূপে। ইতিমধ্যে ধনপতি আবার সিংহলে বাণিজ্যে যাওয়ার উদ্যোগ করে, স্ত্রী খুল্লনা স্বামীর মঙ্গলকামনায় চণ্ডীর ঘট পেতে পূজা করতে বসে; শৈব ধনপতি পদাঘাতে সেই পূজার ঘট ভেঙে দেন। পরিণামে দেবী চণ্ডীর কোপে ধনপতির বাণিজ্যতরী ডুবে যায়, ধনপতি দেবী চণ্ডীর মায়ায় কমলেকামিনী রূপ দেখেন। ধনপতি সিংহলের রাজাকে এই দৃশ্যের কথা বললে, রাজা তা বিশ্বাস করেন না, ধনপতিও রাজাকে সেই দৃশ্য দেখাতে না পারার অপরাধে কারারুদ্ধ হন। ইতিমধ্যে খুল্লনার গর্ভজাত সন্তান শ্রীমন্ত বড় হতে থাকে। মায়ের কাছ থেকে সব বৃত্তান্ত শুনে শ্রীমন্ত পিতার সন্ধানে সিংহল যাত্রা করে। সেও কমলেকামিনী দৃশ্য দেখল এবং একই ভাবে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে না পারার কারণে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হল। পরে মায়ের নির্দেশমত দেবী চণ্ডীর স্তব করে উদ্ধার পেল। সিংহলরাজ পরে সমস্ত বিষয় অবগত হয়ে পিতা – পুত্রকে মুক্ত করে দেন এবং কন্যা সুশীলার সঙ্গে শ্রীমন্তের বিবাহ দেন। এরপর ধনপতি সসম্মানে দেশে ফিরে আসেন। মহাসমারোহে দেবী চণ্ডীর পূজা প্রচলন হয়, রত্নমালা ও মালাধর স্বর্গে ফিরে যান।